ভারতের জাতীয় আন্দোলনে গান্ধিজীর ভূমিকা

নন্দিনী মুখোপাধ্যায় (চক্রবর্তী)
C¢aq¡p ¢h i ¡N, হীরালাল মজুমদার কলেজ ফর উইমেন

মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী ১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর কাথিয়াবাড় বা সৌরাষ্ট্রের পোরবন্দরে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল করমচাঁদ গান্ধী এবং মায়ের নাম ছিল পুতলী বাঈ। মোহন দাস ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা সেপ্টেম্বর ইংলন্ডে গমন করেন ব্যারিষ্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মোহন দাস ব্যারিষ্টারি পাশ করেন। ভারতবর্ষে ফিরে আসলেও তিনি দক্ষিZ B¢éL¡কে তার কর্ম ক্ষেত্র হিসাবে বেছেনেন। ১৮৯৩ সালে মে মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে উপস্থিত হন। শুরু হয় তাঁর জীবনের এক নতুন AdÉ¡uz[1]

মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতে ১৯১৯ এর মার্চ মাসে 'রাওলাট আইনের' বিরুদ্ধে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে তার রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেন। সেই সময় তাঁর বয়স ৫০ বৎসর। কিন্তু গান্ধিজীর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে দক্ষিণ আফ্রিকায়। এইখানেই তিনি অহিংস সত্যাগ্রহের পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। সুতরাং গান্ধিজীর রাজনৈতিক জীবনের আলোচনা শুরু LI¡ E¢Qa c¢rZ B¢éL¡u b¡L¡L¡m£ন তাঁর রাজনৈতিক কর্মকান্ডের পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে।[2]

c¢rZ BéL¡u i¡la£u দের অভিবাসন শুরু হয়েছিল ১৮৯০ সালে। এখানে শ্বেতাঙ্গদের খেত ও চিনিকলে কাজ করার জন্যে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকরা প্রথমে এসেছিল পরে এসেছিল ভারতীয় ব্যবসায়ীরা যাদের মধ্যে বেশীর ভাগি ছিলেন ভারতীয় মুসলমান। দক্ষিণ আফ্রীকায় hph¡pL¡l£ HC pjÙ i¡la£ul¡ hZ বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন। গান্ধী নিজেও প্রিটোরিয়া এবং জোহানেসবার্গে ভারতীয় বলে রেলে এবং হোটেলে লাঞ্ছিত হন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয়রা সেই সময় নানা রকম বৈষম্যমূলক আইনের সম্মুখীন হয়েছিল। যেমন তাদের কোন ভোটাধিকার ছিল না। তাদের প্রত্যেককে পৃথকভাবে সরকারের কাছে নাম নথিভুক্ত বা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নেওয়া ছিল বাধ্যতামূলক এবং এই সার্টিফিকেট সবসময় নিজের কাছে রাখাও ছিল বাধ্যতামূলক। ভারতীয় বলে তাদের বিশেষ ধরনের করও দিতে হত। ঘিঞ্জি ও অস্বাস্থ্যকর এলাকায় তাদের বাস করতে হত। 'ফুটপাত' এর উপর দিয়ে তাদের হাঁটারও অধিকার ছিল না - Hje ¢L রাত্রি নটার পর তাদের ঘরের বাইরে যাবার আইনও ছিল না। গান্ধিজী এই সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবাদ কারার সিদ্ধান্ত নিলেন। গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিলেন কয়েক মাসের জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকলেন বিশ বছর। যখন এসেছিলেন তখন তার বয়স ছিল পঁচিশ যখন চলে গেলেন তখন পঁয়তাল্লিশ।[3]

c¢rZ B¢éL¡u ভারতীয়দের স্বার্থ রক্ষার আন্দোলন ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্ব এবং এখানেই তিন প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন তার সত্যাগ্রহের আদর্শ। 'সত্য' ও 'আগ্রহ'

অর্থাৎ সত্যের প্রতি আগ্রহ থেকেই ‘সত্যাগ্রহ‘ কথাটি এসেছে। ‘সত্যাগ্রহ সম্পর্কে তাঁর ধারনা ও মতবাদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গান্ধিজী বিভিন্ন আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন যেমন জন্মস্থান গুজরাটের জৈন ধর্ম, পারিবারিক বৈo·h dj, HXECe Beô HI hÜ S¢he¡ (Light of Asia), বিখ্যাত ইংরেজ লেখক রাসকিন রচিত ‘শেষ পর্যন্ত‘ (Unto The Last), l¦n p¡¢q¢aÉL VmØVu-এর ‘ঈশ্বরের রাজ্য Kingdom of God এবং থরো ও এমারসনের রচনা। l¡Se£¢aর ক্ষেত্রে গান্ধিজীর প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ এক অভিনব নীতি বা কৌশল। সত্যাগ্রহের মূল ভিত্তি সত্য এবং অহিংসা। সত্য এবং অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামকে তিনি ‘সত্যাগ্রহ‘ বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন “শত্রুর প্রতি যে মানুষ বিদ্বেষ পোষণ না করে এবং কোনভাবে শত্রুকে আঘাত el করে সেই মানুষই যথার্থ সত্যাগ্রহী”z

তাঁর মতে সত্যাগ্রহ হল আত্মার শক্তি বা প্রেমের শক্তি। সত্যাগ্রহী অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্যের দ্বারা শান্তিপূর্ণ ভাবে অনাচারের প্রতিবাদ করবে; সে কখনই হিংস্র হয়ে উঠবে না। মুখ বুজে সব অত্যাচার সহ্য করে অত্যাচারীর হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানোই হল সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য। সত্যাগ্রহী অন্যায় কে ঘৃণা করবে কিন্তু অন্যায়কারীকে নয়। সত্য¡গ্রহ হল সবলের AÙ, কারন কেবলমাত্র প্রবল আত্মসংযম এবং নৈতিক বল থাকলেই মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করেও অত্যাচারীর মঙ্গলকামনা করা যায়। তিনি প্রেমের দ্বারা ঘৃণা, সত্যের দ্বারা অসত্য এবং নির্যাতন ভোগের দ্বারা হিংসা জয়ের কথা বলতেন। সংগ্রামের এই নতুন পদ্ধতিই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় শক্তিশালী শেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে সত্যাগ্রহের পদ্ধতি প্রয়োগ ছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকাতেই গান্ধিজী তার অর্থনৈতিক মতাদর্শকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জোহানেসবার্গ থেকে ২১ মাইল দূরে প্রতিষ্ঠা করেন ‘টলস্টয় খামার (Tolstoy Farm)z HC খামারে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর আদর্শ অনুযায়ী সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। তিনি সেখানে ছোট কমিউন গড়ে তোলেন; সেখানকার জীবন যাত্রা ছিল প্রচলিত জীবন যাত্রার থেকে পৃথক এবং fQ¢ma Bb¢ p¡j¡জক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।[4] এই খামারে দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় বন্দীদের পরিবারগুলি আশ্রয় নিয়েছিল, যাদের সংখ্যা ছিল ৫০ থেকে ৭৫ এর মধ্যে। এখানে রান্নাঘর ছিল একটাই। প্রত্যেকেই ছিল নিরামিষাশ£ Hhw N¡¢åS£ প্রত্যেককেই কঠোর শারিরীক পরিশ্রম করতে হত। S¡j¡ন স্থপতি কেলেন বাকের (Kallen bach) তত্ত্বাবধানে এখানকার বাসিন্দারা কাঠের কাজ, জুতা তৈরী করা প্রi¢a L¡S LIaz[5]

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধিজী পুরোপুরি সফল না হলেও তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলনার ফলে এখানকার শেতাঙ্গ সরকার (রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট) ও ভারতীয় প্রথা অনুযায়ী বিবাহ সম্পর্কে [6] ভারতীয়দের কয়েকটি বড় দাবি মেনে নিয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধিজী পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব তার পরবর্তী জীবনের রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রভাবিত

করেছিল। এই আন্দোলন তাকে সংগঠক, সাংবাদিক, প্রচারক, অর্থ সংগ্রাহক ও নেতা হিসাবে তুলে ধরে এবং এই পদ্ধতি অর্থাৎ সত্যাগ্রহের পদ্ধতি তিনি পরবর্তীকালে ভারতে প্রয়োগ করেন।[7] দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন তিনি যাদের নিয়ে আন্দোলন করেন তাদের বেশীর ভাগই ছিলেন মুসলিম, এর ফলে গান্ধিজী ভারতীয় মুসলিমদের শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও আস্থা অর্জন করতে সক্ষম qe, k¡ awL¡m£e [8] অপর কোন ভারতীয় হিন্দু নেতা পারাননি। একই সঙ্গে এই আন্দোলন গান্ধিজীকে আন্তজার্তিক খ্যাতি এনে দেয়। ঐতিহাসিক এস. আর মেহরোত্রার মতে গান্ধিজী ছিলেন ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামে দক্ষিণ আফ্রিকা আন্দোলনের সবচেয়ে বড় উপহার। [9]

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী গান্ধিজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসেন শুরু হয় তার রাজনৈতিক জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। ভারতে ফিরে এসে গান্ধীজি গোপাল কৃষ্ণ গোখলের পরামর্শে কোন সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহন করলেন না। ১৯১৫ সালে তিনি সারা ভারত পরিভ্রমন করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারa£u pj¡S, জনজীবন ও রাজনীতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করা। ১৯১৫ সালেই তিনি আমেদাবাদে সবরমতী আশ্রম (যা সত্যাগ্রহ আশ্রম নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর অনুগামী ও বন্ধুদের সত্য স্বাবলম্বন, গ্রাম উন্নয়ন ও অহিংসার বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষাদান করতে শুরু করেন।

১৯১৯ এ সর্বভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহনের পূর্বে গান্ধিজী তিনটি আঞ্চলিক আন্দোলনে অংশগ্রহন করেন। এই তিনটি আন্দোলন ছিল চম্পারণে সত্যাগ্রহ (১৯১৭), আমেদাবাদে শ্রমিক ধর্মঘট (১৯১৮) ও গুজরাটের খেড়া জেলায় কৃষক আন্দোলন। চম্পারণে নীলকর সাহেবরা তিন কাঠিয়া প্রথা অনুসারে চাষীদের ৩/২০ অংশে নীল চাষ করতে বাধ্য করত এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল খাজনা ও নানা রকম জবরদস্তি মূলক কর, যা সেই অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। এখানকার নেতাদের অনুরোধে গান্ধী চম্পারণে উপস্থিত হন। ক্রুদ্ধ সরকার তাঁকে বন্দী করেও শেষ পর্যন্ত মুক্তি দিতে ও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে বাধ্য হন যার ফলে 'চম্পারণ কৃষি বিল' পাশ করে চম্পারণে তিন কাঠিয়া প্রথা তুলে দেওয়া হয়।

চম্পারণের পর গান্ধিজী আমেদাবাদে সূতাকল শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবি সমর্থন করে তাদের অহিংস ধর্মঘট করার পরামর্শ দেন এবং নিজে অনশন শুরু করেন। আন্দোলনের ব্যাপকতায় ভীত হয়ে ¢jm Laf¤r আন্দোলনের চতুর্থ দিনে শ্রমিকদের বেতন শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি করেন।

গুজরাটের খেড়া জেলার কৃষক আন্দোলনেও তিনি ১৯১৮ সালে অংশ গ্রহন করেন। ১৯1৮ সালে অজন্মার ফলে খেড়া জেলার কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে তা সত্ত্বেও রাজস্ব আদায়ের জন্য সরকার নানাভাবে তাদের উপর উৎপীড়ন করতে থাকে। গান্ধিজি এখানে সত্যাগ্রহ শুরু করেন এবং প্রজাদের কোন প্রকার কর না দেওয়ার আহ্বান জানান। আন্দোলনের চাপে সরকার শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন।

p¢ja pIL¡I a¡I Modern India গ্রন্থে বলেছেন যে এই সমস্ত আন্দোলনগুলিতে স্থানীয় নেতাদের ভূমিকা ছিল গান্ধিজীর থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ন।[10] কিন্তু আঞ্চলিক নেতাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও এই আন্দোলনগুলির মধ্য দিয়ে তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজির গ্রহনযোগত্য বহুগুন বৃদ্ধি পায়। এই আন্দোলনগুলির মধ্য দিয়ে ভারতীয় জনগন যেমন সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের এক নতুন পথের সন্ধান পায় তেমনি গান্ধি ভারতal n¢jL J কৃষকের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন। নতুন যুগের রাজনৈতিক কর্মীরা তার মধ্যে পেলেন অনুপ্রেরণা ও নেতার সন্ধান। গান্ধীর আদর্শ ও নিষ্ঠা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই আকৃষ্ট করল। ১৯১৯ সালের রাওলাট সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে গান্ধিজী সর্বভারতীয় রাজনীতির আঙ্গিনায় প্রবেশ করেন এবং জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯১৫ সালে ভারতবর্ষে এসে মাত্র চার বৎসরের মধ্যে কিভাবে ও কেন গান্ধিজী ভারতীয় রাজনীতির নেতৃত্ব পদে আসীন হন তার প্রেক্ষাপট একটু বিবেচনা করা দরকার।

1914-১৯ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল। ভারতবাসী অর্থ দিয়ে এবং সৈন দিয়ে এই যুদ্ধে ইংল্যান্ডকে সাহায্য করাছিল। যুদ্দকালীন পরিস্থিতিতে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক দুর্দশা চরমে ওঠে। এই সময় জাতীয় ঋণের পরিমান বেড়েছিল ৩০শতাংশ যার অনেকটাই ভারতবাসীকে বহন করতে হয়েছিল। জিনিসপত্রের দাম যেমন একদিকে আকাশছোয়া হয়ে পড়ে তেমনি নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস যেমন কেরোসিন তেল ইত্যাদি দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। ১৯১৮-১৯ সালের খরা পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তোলে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যবসায়ীদের মুনাফার লোভ ও n¢jL R¡V¡Cz

সাধারন মানুষের এই ক্ষোভ ও দুর্দশা জাতীয় আন্দোলন শুI¦ LI¡I AeLm f¢I¢Ü¢a p¢ø Lরলেও ভারতীয় জাতীয় নেতৃত্ব ছিল কিছুটা দিশাহারা। নরমপন্থীদের দুর্বল নেতৃত্ব, চরমপন্থীদের ব্যর্থতা এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ কোন কিছুই সাধারন মানু0কে অনুপ্রাণিত করতে পারেনি। তৎকালীন জাতীয় নেতৃবৃন্দের অনেকের যেমন উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দও ও গোবিন্দ রানাডে ও বদরুদ্দিন তায়েবজী আগেই মারা যান। ১৯১৫ সালের পর মারা যান গোপালLo· গোখেল ও ফিরোজ শাহ মেহেতা। শ্রী অরবিন্দ রাজনীতির সংস্রব ছেড়ে দেন-এর ফলে জাতীয় নেতৃত্বে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়। ১৯১৬ সালে কংগ্রেসে নরমপন্থী চরমপন্থী ঐক্য ও মুসলিম লীগের সঙ্গে লক্ষৌ চুক্তি ও ভারতীয় রাজনীতিতে কোন গতিশীলতা আনতে ব্যর্থ হয়। বাল N‰¡dI ¢amL Hhw AÉ¡¢e বেসান্তের নেতৃত্বে হোমরুল আন্দোলন ভারতীয় রাজনীতিকে কিছুটা গতিশীল করলেও এই আন্দোলন প্রধানত দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে সীমাবদ্ধ থাকে।

উপরিউক্ত পরিস্থিতি জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে আসে। বস্তত পক্ষে সেই সময় দরকার ছিল এমন একটি মতাদর্শ ও কর্মপদ্ধতি যা ভারতের সর্বস্তরের মানুশের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এবং সমাজের পরস্পর বিরোধী স্বার্থশুলিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে সামিল করানো যায়।এই অসাধ্য কাজটি করতে যিনি এগিয়ে আসলেন তিনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।ভারতবাসী কেন তাকে গ্রহণ করল এর উওর খুঁজতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় তাঁর সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদ, সরল হিন্দীতে কথা বলা

ইত্যাদি সাধারণ মানুষকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ইতিমধ্যেই তিনি চম্পারণ, আমেদাবাদ ও খেড়ার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের তাঁর পথ ও মতের যথার্থতা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। এখানে তিনি সাধারণ কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থ নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এই দুই শেণী তাকে পরিত্রাতা হিসাবে দেখতে শুরু করেছিল। c¢rZ আফ্রিকার আন্দোলনও তাকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। ইতিমধ্যে ১৯০৯ সালে তাঁর 'হিন্দস্বরাজ' পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল যাতে তিনি পশ্চিমী যন্ত্র নির্ভর সভ্যতাকে তীব্রভাবে আঘাত করেছিলেন। আধুনিক শিল্প, রেলপথ, আইনজীবী চিকিৎসক যা পশ্চিমী সভ্যতার দ্বারা ভারতে আমদানী হয়েছিল সবকিছুরই তিনি তীব্রভাষায় সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর কথায় ' রেলপথ মড়ক ছড়িয়েছে খাদ্যশস্যে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করছে রপ্তানীতে উৎসাহ দিয়ে, মামলার লোভে আইনজীবীরা ইন্ধন জুগিয়েছে বিবাদে, পশ্চিমী ওষুধপত্র ব্যয়বহুল ও স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নাশক সুতরাং গত ৫০ বৎসরে ভারতবাসী যা শিখেছে তা ভুলে যাওয়ার মধ্যেই মুক্তি । [11] p¢ja সরকার মন্তব্য করেছেন যে বিভিন্ন পরিশীলিত নাগরিক গোষ্ঠীর কাছে তাঁর এই সব বক্তব্যের খুব একটা আবেদন ছিল না।কিন্তু অনেকের কাছে এর আবেদন ছিল যেমন যে কারিগর কারখানা শিল্পের জন্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, যে কৃষকের কাছে আদালত ছিল বিপর্যয়সূচক ফাঁদ ও শহরের হাসপাতাল এক ব্যয়বহুল মৃত্যু দন্ডাজ্ঞা তাদের কাছে গান্ধীর এই আধুনিক শিল্প বিরোধী বক্তব্য খুবই গ্রহনযোগ্য হয়েছিল। [12] বস্তুতপক্ষে গান্ধিজী সাধারন শ্রমজীবী মানুষের কাছে হয়ে উঠলেন HL f¢lœ¡a¡ z কৃষক সম্প্রদায় তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করল এমন এক ব্যক্তিকে যিনি জমিদারী অত্যাচার বন্ধ করতে সক্ষম, যুক্ত প্রদেশের ভূমিহীন কৃষক ভাবল এবার সে জমি পাবে। তাঁর কথা শোনার জন্য তাঁর আদেশ পালন করার জন্য সাধারণ মানুষ hÉ¡Lm হয়ে পড়ল। বস্তুতপক্ষে গান্দীজীর আগে আর কোন ভারতীয় নেতা এই ধরনণের ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে পারেননি।

১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার বৈপ্লবিক কার্যকলাপের মোকাবিলা করার জন্য কুখ্যাত রাওলাট আইন জারী করেন যার মূল ধারা ছিলো বিনা বিচারে যে কোনো ব্যক্তি কে আটক করে রাখার প্রশাশসনিক ক্ষমতা। গান্ধিজী এই আইনকে বললেন 'evidence of a determined policy of repression" তিনি এই অইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে phi¡la¢u l¡Se¢al l‰মঞ্চে প্রবেশ করলেন। শুরু হলো ভারতের জাতীয় আন্দোলনের এক eae Ad£¡uz

রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে তিনি তার সত্যাগ্রহ পদ্ধতি অনুসারে pa£¡Nq pi¡ NWe করেন এবং একটি শপত নামা রচনা করলেন। ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল সারা ভারত ব্যাপী হরতালের ডাক দিলেন।রাওলাট আন্দোলনের প্রভাব ভারতের সর্বএ সমান ভাবে অনুভূত হয়নি বোম্বাই, আমেদাবাদ, মাদ্রাজ, বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের লাহোর ও অমৃতসর ছাড়া এই আন্দোলন তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। জভুডিস ব্রাউনের মতে রাওলাট সত্যাগ্রহ কার্য্য হয়েছিল। [13] সর্বেপরি রাওলাট আইন বাতিল হয়নি উপরন্ত ব্রিটিশ সরকার দমন নীতি চালাতে থাকে যার চরম প্রকাশ দেকতে পাওয়া যায় 1919 p¡লে ১৩ই এপ্রিল জালিনওলাবাগের

হত্যাকান্ড দেখিয়ে দিল যে ব্রিটিশ শাসনের নিষ্ঠুরতা কোন পর্যন্ত যেতে পারে। তাই এই হত্যা কান্ডের এক বছরের মধ্যেই গান্ধিজীর নেতৃত্বে শুরু হল অহিংস আসহযোগ আন্দোলন(১৯২০) z

১৯২০ সালের আসহযোগ আন্দোলন গান্ধিজী যে কর্মসূচী গ্রহন করলেন তা ছিল এক সঙ্গে তার রাজনৈতিক,সামাজিক এবংঅর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ। ১৯২০ সালে গান্ধিজীর নেতৃত্বে যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তা ছিল এক সর্বভারতীয় গণ আন্দোলন যার লক্ষ্য ছিল 'স্বরাজ' অর্জন। এই আনদোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল খিলাফৎ আন্দোলন। তুরস্কের সুলতান প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইঁংল্যান্ডের শত্রু জার্মানীর পক্ষে যোগ দেওয়ায় যুদ্ধ শেষে মিত্রশক্তি তুরস্কের সাম্রাজ্য বাবচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তুরস্কের সুলতান যা খলিফা ছিলেন মুসলিম জগতের ধর্মগুরু। সুতরাং তার সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদ করার প্রচেষ্টা হলে ভারতীয় মুসলমানগণ ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠে এবং খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করে। গান্ধিজী তাদের এই দাবী সমর্থন করে খিলাফৎ আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন সঙ্গে যুক্ত করেন। এর ফলে এই আন্দোলনে হিন্দু মুসলিম যৌথ ভাবে যোগদান করে।যদিও গান্ধিজী এই সিদ্ধান্তের জন্য সমালোচিত হন কারণ এটি ছিল একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সমস্যা যার সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু এই দাবী সমর্থন করার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু -jp¢mম যৌথ আন্দোলন সম্ভবপর করে তোলা।

অসহযোগ আন্দোলনের রাজনৈতিক দাবী - ül¡S Aর্জন ও খিলাফৎ সমস্যার সমাধানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জালিয়াগওলাবাগের নৃশৎস হত্যা কান্ডের প্রতিকার কর্মসূচীর মধ্যে গৃহত হয়েছিল সরকারী চাকরী, অনুষ্ঠান, খেতাব, স্কুল, কলেজ আইন সভা ও বিদেশী পণ্য বর্জন সেগুলিকে বলা যায় নেতিবাচক। ইতিবাচক কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে গান্ধজীর অথ°e¢aL J p¡j¡¢SL Bcn pjq f¢aফলিত হয়েছিল যেমন দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন, সালিশী বোর্ড গঠন, মাদক hSe, AØfnÉa¡ f¢lq¡l Hhw QIL¡ J M¡¢cl hÉ¡fL fQmez QIL J M¡¢c ehS¡Na জাতীয়তা বোধের প্রতীকে পরিণত হল।

গান্ধিজীর আহ্বানে সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা দেখা দিল। ডঃ a¡রাচাঁদ বলেছেন 'সর্বত্রই উৎসাহ উদ্দীপনা দেশপ্রেম ও ত্যাগের অভূতপূর্ব দৃশ্যাবলী পরিলক্ষিত quz[14] বিপিনচন্দ্র বলেছেন -'এ যেন ছিল এক ঘুমন্ত দৈত্যের পূর্ণজাগরন'[15] বস্তুতপক্ষে গান্ধীজির আহ্বানে ছাত্র ও শিক্ষক স্কুল কলেজ ত্যাগ করে উকিল ব্যারিষ্টার আইন আদালত ত্যাগ করে। উত্তর প্রদেশের অযোদ্ধ্যা, ফৈজাবাদ, প্রতাপগড়, রায়বেরিলী, গুজরাটের বারদৌলী, আহমেদাবাদ, খেদা, বিহারের মজফফরপুর, ভাগলপুর, পুর্ণিয়া, মুঙ্গের দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যপক কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। জওহরলাল নেহেরু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন 'সমগ্র গ্রামাঞ্চল উদ্দীপনার এক আশ্চর্য উত্তেজনায় ভরপুর হয়ে উঠেছিল'।[16]

nমিক শ্রেণীও প্রবল উৎসাহের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২১ সালে ৩৯৬ টি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় যাতে প্রায় ৬ লক্ষ শ্রমিক অংশ গ্রহন করে এই সময়কার ধর্মঘটগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলার পাটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট, মাটিনবার্ন ও জেসপ কারখানাগুলিতে ধর্মঘট, রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লাখনিগুলিতে ধর্মঘট এবং আসামের ইংরেজ মালিকাধীন চা বাগানগুলিতে djOVz

আন্দোলনের ব্যপকতায় ভীত হয়ে সরকার নিষ্ঠুর দমননীতির আশ্রয় নেন। কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ফৌজদারি দন্ডবিধির ১০৮ ও ১৪৪ ধারা জারী করা হয়, বহু স্থানে লাঠি ও গোলি চলে। তা সত্ত্বেও আন্দোলন চলতে থাকে।

আন্দোলনের সাফল্য দেখে মহত্মা গান্ধী বারদৌলী থেকে আইন অমান্য আন্দোলনে শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই ঘটে যায় চৌরিচৌরার ঘটনা যাতে জনতা উত্তেজিত হয়ে থানায় অগ্নিসংযৌগ করে এবং ২২ জন পুলিশ কর্মী নিহত হন। শান্তির পূজারী গান্ধীজির পক্ষে এরা মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯২২ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারী কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়।

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য গান্ধীজীর জনপ্রিয়তা প্রভূত পরিমানে হ্রাস পায়। তিনি কংগ্রেস নেতাদের দ্বারা, এমন কি বিদগ্ধ পন্ডিত রোমা রোলাঁর দ্বারা সমালোচিত হন সবচেয়ে কঠোর সমালোচক ছিল মার্কসবাদীদের রজনী পাম দত্ত। এম. এন. রায়, মিজাফফর আহম্মদ প্রভৃতিরা তীব্রভাবে সমালোচনা করে তাঁকে ‘বিশ্বাস ঘাতক‘ রূপে আখ্যায়িত করেন।[17] তাদের বক্তব্য ছিল আন্দোলন যেহেতু শ্রণী সংগ্রামের পথে চলে যাচ্ছিল তাই বিত্তবান শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করার জন্য তিনি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। গান্ধীজি ১৯২২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় লেখেন ‘আমি সকল প্রকার অপমান এমন কি নির্যাতন, পূর্ণ ¢eh¡pe Hhw মৃত্যু বরণে প্রস্তুত। কিন্তু আমি আন্দোলনকে হিংসার পথে যেতে দিতে পারি না। দেশব্যাপী হিংসার প্রকাশ ঘটলে কে তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে।[18]

বস্তুতপক্ষে গান্ধীজি এটা জানতেন যে জনসাধারন হিংসার আশ্রয় নিলে সরকার যে প্রতিহিংসার পথ নেবে তাতে শতশত নিরীহ মানুষের প্রাণ যাবে। তাছাড়া তিনি এটাও উপলব্ধি করতে পারছিলেন যে আন্দোলনের ভিত ক্রমশ আলগা হয়ে যাচছিল। ছাত্র, শিক্ষক বিভিন্ন পেশার মানুষ জীবিকা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় অধৈর্য হয়ে উঠছিল। তুরস্কে কামাল পাশার নেতৃত্বে খলিফা পদের বিলুপ্তি খিলাফৎ আন্দোলকেই অর্থহীন করে তুলেছিল।

সুমিত সরকার তার ‘আধুনিক ভারত‘ গ্রন্থে লিখেছেন যে গান্ধী বারে বারে প্রভূত পরিমানে শতর্কবাণী দিয়েছিলেন যে শ্রেণী সংগ্রাম বা সমাজ বিপ্লবে তার আদৌ কোন আগ্রহ নেই। গান্ধী যেই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন গোটা আন্দোলনই ভেঙে পড়ল এর থেকে প্রমাণিত qu N¡å£l বিকল্প কোন নেতৃত্বও ছিল না।

অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হলেও গান্ধিজীই সর্ব ভারতীয় জাতীয় নেতা রুপে প্রতিষ্ঠিত হন, জহর লালা নেহেরু বলেন জন মানসে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে যে ভীতি ছিল গান্ধিজী সেই ভীতি দূর করেন। সুভাস চন্দ্র বসু তার আত্ম জীবণি তে লেখেন গান্ধীজী কংগ্রেস কে একটি বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানে পরিনত করেন। [20] সর্বোপরি বিভিন্ন সামাজিক ব্যধি সম্পর্কে জনগন কে সচেতন করেন, তার প্রদর্শিত পথে খাদি ও কুটির শিল্পের বিকাশ হয়।

১৯২২ সালের ২৫ ফেব্রয়ারী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার কর নেওয়ার পর ১০ মার্চ গান্ধীজী কে গেফতার করা হয়। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হবার পর কিছু দিনের জন্য জাতীয় আন্দোলনে ভাটা পরে। ১৯২২ - ২৭ মধ্যে যে সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনাবলী উল্লেখযোগ্য

তা হল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল গঠন। তারা নির্বাচনে অংশ গ্রহন করে আইন সভায় প্রবেশ করে সরকার বিরোধীতার নীতি অনুসরণ করে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় হিন্দু মুসলীম দের মধ্যে যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল এই সময় তা ক্রমশ বিলীন হয়ে যায়। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯২২ থএকে ২৭ এর মধ্যে মোট ১১২টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় যাতে প্রাণ হারায় ৪৫০ জন মানুষ এবং আহত হয় ৫০০০ এর বেশি মানুষ। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই সম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এছাড়া দক্ষিণ ভারত, পূর্ববঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলে জাতপাতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠনের চেষ্টা শুরু হয়। বস্তত জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তখন চলছিল এক অবাসদ ও হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা। জাতীয় জীবনের এই থন অন্ধকারের দিনে ব্রিটিশ সরাকর এমন এক কাজ করলেন যার ফলে ঝিমিয়ে পড়া ভারতীয় রাজনীতি আবআর দ্বিগণ তেজে জ্বেল উঠল।

1927 সালের ৮ই নভেম্বর ব্রিটিশ পার্লামেনন্ট ইংl¡S BCe‘ pÉ¡l Se pBCje¡l নেতৃত্বে সাতজন ব্রিটিশ সাংসদকে নিয়ে এক কমিশন গনঠ করে যার উদ্দেশ্য ছিল ভারেতর ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে প্রস্তাব দেওয়া। যেহেতু এই কমইশনে কোন ভারতীয় সদস্য ছিল নআ তাই এই সিদ্ধান্ত ভারতবাসীর কাছে জাতীয় অপমান বলে প্রতিভাত হয়। ভারেতর প্রায় pjù রাজনৈতিক দল এই কমিশন বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয় "Go back simon" h¡ "p¡Cje ফিরে যাও‘ এই ধ্বনির মধ্য দিয়ে ঘুমন্ত জাতীয়তাবাদ আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। লাহোরে এক সাইমন কমিশন বিরোধী মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে হিয়ে সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা লালা লাজপৎ রায় ১৯২৮ সালের ৩০ শে অক্টোবর পুলিশের হাতে নির্মমভাবে প্রহৃত হন এবং ১৭ই নভেম্বর তাঁর jaÉ quz

ইতিমধ্যে ভারত সচিব লর্ড বার্কেন হেড সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের যোগত্যার প্রশ্ন তুলে বিদ্রুপ করায় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৯ শে মে বোম্বাইতে এক সর্বদলীয় সম্মেলনে মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে নেহেরু কমিটি গঠন করা হয় যার উপর ভারতের ভবিষ্যত সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই খসড়া সংবিধান নেহেরু রিপোর্ট নামে পরিচিত কিন্তু এই রিপোর্টে পূর্ণ স্বাধীনতাকে লক্ষ্য না করে ঔপনিবেশিক স্বায়তশাসনকে লক্ষ্য হিসাবে স্থির করা হলে কংগ্রেসের তরুন গোষ্ঠী যার নেতৃত্বে ছিলেন জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র বসু এর তীব্র বিরোধিতা করেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। এই পরিস্থিতিতে মহত্মা গান্ধীর মধ্যস্থতায় স্থির হয় যে এক বৎসরের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন না পেলে পূর্ণ স্বরাজের জন্য আন্দোলন শুরু করা হবে। বড়লাট আরউইন এক বৎসরের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করেন ফলে ১৯২৯ এ কংগ্রেস পূর্ণস্বরাজ এর প্রস্তাব গ্রহন করে। লক্ষ্য পূরনের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব গৃহীত হয়, নেতৃত্ব অর্পিত হয় মহত্মা গান্ধীর উপর।

বস্তুতপক্ষে গান্ধীজি উপলব্ধি করতে পারছিলেন যে কংগ্রেসের সংহতি বিপন্ন হতে চলেছে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন এবং বিপ্লবীদের কার্যকলাপের ফলে দেশের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে যা অনিবার্যভাবে হিংসার পথে যাবে। গান্ধীর পক্ষে এই পরিস্থিতিকে অবজ্ঞা করা সম্ভবপর ছিল না। অমলেশ ত্রিপাঠি বলেছেন ‘গান্ধী নেতৃত্বের এই মধ্যস্থতায় ভূমিকা ভুললে

চলবে না উদারপন্থীদের সঙ্গে রাখার জন্য যখন সম্ভব তখন তিনি তরুন বিদ্রোহীদের বোঝাতেন, kMe pñh eয় এবং নেতৃত্ব না দিলে আন্দোলন হিংসার পথ নেবে বুঝতেন তখন পেছন ফিরে তাকাতেন না। তবে এটা সত্যাগ্রহীর আদর্শ প্রসূত। নেতৃত্ব হাতে রাখার মধ্যবিত্তসুলভ লোভ fpa euz[21]

১৯২৯ এর ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব নিল। একজন সত্যাগ্রহী হিসাবে তিনি সরকারের হৃদয় পরিবর্তনের আশা নিয়ে ১৯৩০ এর ফেব্রুয়ারী ১১ দফা দাবী পেশ করলেন। এই সব দাবী অগ্রাহ্য হলে তিনি আন্দোলনের পথে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতি গান্ধীকে ইচ্ছামত আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার ক্ষমতা দিল। সুতরাং গান্ধীজির নেতৃত্বের অপরিহার্যতা আবার প্রমানিত হল। তিনি ঘোষনা করলেন লবণ আইন অমান্য করে আরম্ভ হবে তাঁর নতুন আন্দোলন।জহরলাল নাহেরু তাঁরা আত্মজীবনীতে স্পষ্ট স্বীকার করেছেন যে আন্দোলন কিভাবে শুরু করা হবে সেই সম্পর্কে তাদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না।১৯৩০ সালের ১২ মার্চ অর্ধনগ্ন ফকির তাঁর জরাজীর্ণ হাতে দীর্ঘ যষ্ঠি তুলে নিয়ে phlja£ Bnমে থেকে সুদূর আরব সমুদ্রের উপকূলে ডান্ডি অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। pjÙ ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠে তাঁর পায়ের সঙ্গে পা মেলাল। সে অপূর্ব ছবি ধরে রেখেছেন অমর ¢nÒf£ e¾cm¡m hpz[22] লবন আইন ভঙ্গের মধ্য দিয়ে আন্দোলন শুরু করা ছিল গান্ধীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় কারন এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসকে অবলম্বন করে আন্দোলন শুরু করে তিনি দেশের বৃহত্তর জনগণের সমর্থন আদায় করলেন। ১৯৩০ এর আইন অমান্য আন্দোলনের অভূতপূর্ব সাড়া মিলল। বাংলা, বিহার, দিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটক, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ - সমগ্র ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হল। যেখানে সমুদ্র আছে সেখানে শুরু হল লবন আইন ভঙ্গ আর যেখানে সমুদ্র নেই সেখানে চলতে লাগল নিষিদ্ধ রাজনৈতিক পুস্তিকা পাঠ, বিদেশী পণ্যবস্তু ও মাদক বর্জন, স্কুল কলেজ অফিসের সামনে পিকেটিং। বহু সরকারী কর্মচারী চাকরিতে ইস্তফা দিলেন এবং আইন সভার সদস্য পদত্ত অনেকে ত্যাগ করলেন। গান্ধিজী ১৯৩০ সালের ১০ই এপ্রিল ইয়ং ইন্ডিয়া পচরিকা মারফৎ নারী সমাজকে এই আন্দোলনে অংশ নেবার আহ্বান জানালে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মহিলারা এই আন্দোলনে যোগ দেন। ইতিপূর্বে আর কোন আন্দোলনে এত ব্যাপক pwMÉL নারী অংশগ্রহণ করেনি। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে দুর্ধর্ষ পাঠান উপগাতি অহিংসার আদর্শ নিয়ে এই আন্দোলনে যোগ দেয়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে,মাদ্রাজ ও অন্ধ্রে, বেরারে, পাঞ্জাবে, উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন ভাবে আইন অমান্য আন্দোলন করা হলেও গান্ধীজীর মূল লক্ষ ছিল লবণ আইন ভঙ্গ করা। গান্ধীজী সুরাট জেলার ধরসানায় সরকারী লবণ গোলা দখল করা স্থির করলর ১৯৩০ সালের ৫ইমে তাকে গ্রেপ্তার করে ওয়ার্ধা জেলে আটক করে রাখা হয়। গান্ধীজীর গেপ্তারের বিরুদ্ধে বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লি, শোলাপুর প্রভৃতি শহরে প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে। শোলাপুরে কার্যত গণ বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়।

আন্দোলন দমন করার জন্য সরকার নিষ্ঠুর দমন নীতি অনুসরণ করেন

-সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরন, কংগ্রেশকে বেআইনী ঘোষণা, নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার, সত্যাগ্রহীদের জমি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, বেত্রাঘাত, গুলিবর্ষণ, লাঠিচালনা সবাই চলচে থাকে। এত অত্যাচার চলতে থাকলেও ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন বড়লাট লর্ড আরউইনকে শঙ্কিত করে তোলে। এই অবস্থায় ভারতবাসীকে আন্দোলন থেকে সরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে তিনি লন্ডনে একটি সর্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠকে প্রস্তাব দেন। কিন্তু পূর্ণ স্বরাজের আদর্শ গৃহীত না qJu¡u কংগ্রেস এই বৈঠক বয়কট করে। এই অবস্থায় কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই ১৯৩০?? ১২ই নভেম্বর থেকে ১৯ শে জানুয়ারী ১৯৩১ পর্যন্ত লন্ডনে প্রথম গোল টেবিল বৈঠক বসে। এখানে বিভিন্ন দলের মত জাতীয় কংগ্রেসের অনুপস্থিতির ফলে এই বৈঠক সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

প্রথম গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হবার পর ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করেন যে জাতীয় কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কোন আলোচনা সম্ভব নয় তাই কংগ্রেসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার কটে গান্ধীসহ সকল কংগ্রেসী নেতাকে মুক্তি দিয়ে গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন যার ফলে 1931 p¡m¡l 5C j¡Q N¡å‡ -আরুইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যাতে সরকারের পক্ষ থেকে স্বৈরাচারী অর্ডিনান্স প্রত্যাহার, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, সত্যাগ্রহীদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফেরৎ এবং যেখানে লবন তৈরী করা সম্ভব সেখানে লোকে স্থানীয় ভাবে লবণ তৈরী করতে পারবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। অপর দিকে গান্ধিজী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে সম্মত হন। এই চুক্তি সম্পাদনের জন্য কংগগ্রেসের বামপন্থী নেতৃবৃন্দ গান্ধীকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। সুমিত সরকার তার The Logic of Gandhian Nationalism প্রবন্ধে বণিক ও শিল্পপতিদের চাপের ওপর জির দিয়ে গান্ধী আরুইন চুক্তি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।23 এটা ঠিক যে শিল্পপতিরা আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করছিল। বোম্বাই এর বনিক সঙ্ঘ গান্ধীর সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। কিন্তু অমলেশ ত্রিপাঠী মন্তব্য করেছেন এরাই শেষ কথা নয়। উদারপন্থীদের তিনি কখনই অবহেলা করেননি যার মধ্য ছিলেন জয়কার, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা। বাংলার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপেও তিনি বিচলিত হয়েছিলেন। আর সত্যাগ্রহী হিসাবে তিনি বিপক্ষকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে চাইতেন তাই তিনি বড়লাটের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত করেন।[24]

১৯৩১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত লন্ডনে দ্বিতীয় গোলবৈঠক বসলে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একমাএ গান্ধীজী বৈঠকে যোগ দেন। ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডে রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় আসে যারা ভারতবাসীর আশা অকাঙ্ক্ষার প্রতি একাবারেই সহানুভূতিশীল ছিল না। আরউইনের স্থলাভিষিক্ত হন ওয়েলিংডন বৈঠক আরম্ভ হবার পূর্বেই তিনি গান্ধী- BIECe Q¢š² ভেঙে ব্যাপক দমননীতি অনুসরণ করতে থাকেন।দ্বিতীয় গোলবৈঠকে গান্ধীজী বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতার বিরোধিতা ও বৈঠক যোগদানকারী অন্যদলগুলির সম্প্রদায়গত স্বার্থের দাবীর বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁর নিজের দাবিতে অবিচল থাকেন। সরকার তাঁর দাবি মানতে অসম্মত হলে শূন্য হাতে গান্ধীজী দেশে ফেরেন।

২৮ শে ডিসেম্বর ১৯৩১ সালে গান্ধিজী দেশে ফিরে দেখেন সরকার গান্ধী আরউইন চুক্তির naiদি ভেঙে প্রচন্ড দমননীতি আনুসরন করছে। তিনি ওয়েলিংডনকে বারবার টেলিগ্রাম করে তা বন্ধ করতে বলেন। কোন সুফল না পাওয়ায় তিনি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি নতুন করে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ডাক দিলেন। শুরু হয় আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৩২-34)z

গান্ধীর ডাকে মানুষ আবার দলে দলে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, দেশ জুড়ে সভা সমিতি, শোভাযাত্রা, বিদেশী পণ্য বয়কট, ইউনিয়ন বোর্ড ও চৌকিদারী কর বয়কট, মাদক বর্জন, আইন অমান্য প্রভৃতি চলতে থাকে আরামবাগ, ত্রিপুরা, শ্রীহ–, Smf¡C...ts, LZ¡VL j¡â¡S, মাদুরাই, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মালাবার প্রভৃতি অঞ্চলে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। একি সঙ্গে সরকারও শুরু করে প্রচন্ড দমন ও পীড়ন নীতি সারা ৩২ সাল ধরে সরকার দশটি অর্ডিন্যান্স জারী করে দেশে পুলিশরাজ প্রতিষ্ঠিত করে। কঠোর দমননীতির পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকার বিভেদনীতি অনুসরণ করতে শুরু করে। আন্দোলনকে দুর্বল করার উদ্দেশ্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড তৃতীয় গোল বৈঠকের প্রাক্কালে ১৯৩২ সালের ১৬ই আগষ্ট 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' নীতি ঘোষণা করে মুসলিম, শিখ, ভারতীয় খ্রীষ্টান, ইওরোপীয় সম্প্রদায়, বর্ণ হিন্দু ও অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের অধিকার দান করেন। হিন্দু সম্প্রদায়কে এইভাবে বিভক্ত করার প্রতিবাদে গান্ধীজি জেলের ভিতর আমরন অনশন শুরু করেন। তফসিলি নেতা আম্বেদকরের সঙ্গে তার টানা ছয় দিন আলোচনার পর আম্বেদকর তফসিলি জাতির জন্য দ্বিগুণ আসন সংরক্ষনের প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে হিন্দুদের যৌথ নির্বাচন নীতিতে স্বীকৃত হন। গান্ধীজি অনশন প্রত্যাহার করে নেন ও তাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর গান্ধীজি হরিজন মুক্তি আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং গণ সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের ডাক দেন। ১৯৩৩ সালের ১লা আগষ্ট থেকে ১৯৩৪ এর মার্চ পর্যন্তেই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ চালু থাকলেও আস্তে আস্তেতা স্তিমিত হয়ে পড়ে। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে বিহারের ভূমিকম্পের পর ১৯৩৪ সালের মে মাসে গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

গান্ধীজি যখন আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন তখন সুভাষচন্দ্র বসু, বিটলভাই প্যাটেল, জওহরলাল নেহেরু সকলেই গান্ধীর সমালোচনা করেন। বস্তুতপক্ষে ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে যে আন্দোলন হয়েছিল তাচে স্বাধীনতা অর্জন করা না গেলেও ভারতীয় জনগনের আরও রূপান্তর ঘটেছিল। আরও শক্তিশালী হয়েছিল লড়াইয়ের মানসিকতা, সম্পূর্ন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আস্থা। বন্দীরা ১৯৩৪ এ জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তাদের দেওয়া হয়েছিল বীরের সম্মান আর প্রকৃত প্রভাব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ১৯৩৭ এর নির্বাচনে যখন কংগ্রেস ১১টি প্রদেশের মধ্যে ছটি প্রদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল।[25]

সমসাময়িকদের মধ্যে একমাত্র গান্ধীজিই আইন অমান্য আন্দোলনের প্রকৃত চরিত্র ও পরিনাম বুঝতে পেরেছিলেন কংগ্রেস নেতাদের কাছে তিনি এই মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন যে হেরে গেছেন এমন কোন মানসিকতা তার নেই বরং তার আশা দেশ দ্রুত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে

চলেছে এবং সেই আশা ১৯২০ র মতি জ্বলজ্বল করছে। বিপিন চন্দ্র মন্তব্য করেছেন যে অন্য নেতাদের তুলনায় তাঁর অবশ্যই একটা সুবিধা ছিল। তা হল অন্য নেতাদের যেখানে রাজনৈতিকভাবে সক্রয় এই মনোভাব বজায় রাখার জন্য আন্দোলনের প্রW¡Se ®Rmz HC ®hL¢f NWejmL L¡S ®Rmz[26] এই বিকল্প গঠনমূলক কাজেই গান্ধীজজি আত্মনিয়োগ করলেন যা হল হরিজন আন্দোলন বা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলন।

এই হরিজন আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করে গান্ধীজি হরিজনদের সমস্যাগুলি নিয়ে প্রচার চালানোর জন্য ট্রেন, মোটরগাড়ি, গোরুর গাড়ি করে ও পায়ে হেঁটে ২০,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি পথ পরিক্রমা করেন, হরিজন লোকসংঘের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। প্রচার করলেন সমস্ত ধরনের অস্পৃশ্যতা দূর করার কথা, এবং সমাজসেবকদের সব কিছু ছেড়ে দিয়ে গ্রামে গিয়ে হরিজনদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য কাজ করতে আহ্বান জানালেন। গান্ধীজির এই হরিজন আন্দোলনের জন্য অনেক গোঁড়া ও প্রতিক্রিয়াশীল মানুষি তাঁর উপর আক্রমন চালিয়েছিল। কিন্তু তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন বলতে চাননি কিন্তু তিনি জানতেন যে অস্পৃশ্যতা যেমন আমাদের সমগ্র সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোকে বিষাক্ত করছে তেমনি এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিনামও হবে ®hl¡Vz বাস্তবিকপক্ষে যখন আন্দোলন হচ্ছে না সেই সময়ে আন্যানা গঠনমূলক কাজের সঙ্গে হরিজনদের মধ্যে কাজ শুধু কংগ্রেস কর্মীদের ব্যস্তই রাখেনি হরিজনদের মধ্যেও ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদের বার্তাও বহন করে নিয়ে গেছে। ঘটনা ক্রমে দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে এরাই ক্ষেতমজুরের কাজ করতেন। গান্ধীজির এই আন্দোলনের ফলে এরা জাতীয় ও কৃষক আন্দোলনের ক্রমশ বেশী করে অংশগ্রহন করতে শুরু করেছিলেন।[27] সুমিত সরকারও স্বীকার করেছেন যে দীর্ঘ মেয়াদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে গান্ধীপন্থীদের হরিজন উন্নয়নের কন্য গ্রামীন সমাজের সবচেয়ে সবচেয়ে নিচুতলার ও সবচেয়ে নিপীড়িত অংশের মধ্যে জাতীয়তাবাদী বাণী ছড়াতে অবশ্যই পরোক্ষ সাহায্য করেছিল।[28]

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ভারত শাসন আইন পাশ করে যার দ্বারা সীমাবদ্ধভাবে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় স্বায়ত্বশাসনের নীতি কার্যকর হয়। ১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের ব্যবস্থা হলে কংগ্রাসের বামপন্থী গোষ্ঠী নির্বাচনবয়কট করার পক্ষে ও দক্ষিণপন্থিরা নির্বাচনে অংশগ্রহন করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। পরিসথিতি এমন অবস্থায় গিয়ে পৌছায় যে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করতে থাকে যে কংগ্রেসে ভাঙন হবেই। এই অবস্থায় আবার পরিস্থিতি সামলাতে এগিয়ে আসেন গান্ধীজি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সংসদীয় রাজনীতি নয় একমাত্র সত্যাগ্রহই স্বধীনতা অর্জনে সক্ষম। তবে কংগ্রেসীদের একটা বড় অংশ যখন সত্যাগ্রহে অংশ নিতে বা গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারছে না তখন এদের জন্যও একটা কাজ চাই। তারা যদি আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করতে ব্যস্তনা হন তাহলে ঃখন কোন আন্দোলন হচ্ছে না সেই সময়ে আইন সভার কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে নিজেদের দেশপ্রেমের পরিচয় দিতে পারেন।[29]

১৯৩৭ এর নির্বাচনে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে জেতার জন্য কংগp phn®Š² দিয়ে নামল এবং সীমিত ভোটাধিকার সত্ত্বেও ১১৬১ টি আসনে লড়ে পেল ৭১৬ টি আসন। সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল অধিকাংশ প্রদেশেই। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করল ছয়টি প্রদেশে।

1937 HI 7C BNø N¡å৷S q৷ISe fœকায় বলেছেন “আমরা যে গতিতে আমাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছি তার গতি বাড়ান যায় না তা দেখার জন্যই মন্ত্রীত্ব নেওয়া হয়েছে।”

১৯৩৭ এ নির্বাচনের ফলে যে সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল সেখানে দেশবাসীর উন্নতিকল্পে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছিল যেমন দমনমূলক আইন প্রত্যাহার, কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য ভূমিরাজস্ব ও ভূমি সংস্কারের পরিকল্পনা, শ্রমিক কল্যানে আইন প্রনয়ণ, গ্রামীন শিল্প প্রসারের জন্য ভর্তুকি, মাদক বর্জন, হরিজন উন্নয়ন ও বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের উপরও জোর দেওয়া হয়।

১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ মুসলিম লীগের নানা অপপ্রচার ও ব্রিটিশ সরকারের বিরোধীতা সত্ত্বেও কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলি তাদের কাজ চালিয়ে যায়। কি¿ 1939 HI ৷àa৷u ৷hnkÜ ভারতবাসীকে আবার এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। হাল ধরতে এগিয়ে আসতে হয় মহত্মা গান্ধীকে।

১৯৩৯ সালে ১ সেপ্টেম্বর নাৎসী জার্মানী পোল্যান্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় বিটেন ও ফ্রান্স ৩ সেপ্টম্বর জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং বিটেন ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা না করেই ঘোষনা করল যে ভারত ও যুদ্ধ করবে জার্মানীর বিরুদ্ধে। এই একতরফা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ২২ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বরের মধ্যে প্রদেশিক মন্ত্রী সভা গুলি থেকে কংগ্রেস পদত্যাগ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্র পক্ষ যেহেতু ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে লড়াই LI৷Rm a¡C N৷åS৷I সহানুভূতিও ছিল ব্রিটেনের প্রতি। কংগ্রসের মধ্যে সমাজ তান্ত্রিক গোষ্ঠি এই সুযোগে আইন অমান্য আন্দোলন শুরুকরার পক্ষপাতী হলেও গান্ধিজীর তাতে সায় ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে যেহেতু এ যুদ্ধ ফ্যাসিবাদের বুরুদ্ধে ও গণতন্ত্রের পক্ষে তা¡C ব্রিটেন কে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে যুদ্ধ শেষ হলে ভারতে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে। এই প্রতিশ্রুতি পেলেই কংগ্রেস এই যুদ্ধে ব্রিটেন কে সাহায্য করবে।

কিন্ত ব্রিটেনের প্রতিক্রিয়া ছিল পুরোপুরি নেতিবাচক। তারা এ ব্যাপারে কোন প্রতিশ্রুতি তো ৷cmC e¡ EfI¿ ৷q¾c- মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ছড়াতে সক্রিয় হয়ে উঠল। ব্রিটেনের এই মনোভাবে ভারতের মানুষের ও জাতীয় নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া ছিল খবি তীব্র। সবচেয়ে ক্রদ্ধ প্রতিক্রিয়া এসেছিল গান্ধীজীর কাছ থেকে যে গান্ধীজী যুদ্ধ কালীন পরিস্থিতিতে ব্রিটেন কে নি: শর্ত সাহায্য দানের প্রবক্তা ছিলেন তিনি ব্রিটেœI Aepa e৷তিতে ক্ষুব্ধহয়ে বললেন “ভাইসরয়ের ভারত সংক্রান্ত বিবৃতি সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করে যে ব্রিটেনের পক্ষে সম্ভব হলে সেবভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে দেবে না। কংগ্রেস রুটি খেতে চেয়ে লাঠি খেয়েছে।” [30] একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করলেন যে ব্রিটিশ সরকার তারা পুরানো ‘ডিভাইড এন্ড রুল নীতি (Divide and rule) অনুসরণ করছে।

এই পরিস্থিতিতে এখনই আন্দোলন শুরু করা হবে কিনা তা নিয়ে কংগ্রেসের নধ্যে মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। দক্ষিনপন্থীরা এখনই আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না কিন্ত বামপন্থীরা ছিলেন। কিন্তু সরকারের চরম প্রতিক্রিয়াশীল নীতি যেমন একের পর এক অর্ডিন্যান্স জারী করে h¡L স্বাধীনতা ও সমিতি গঠনের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, জাতীয়তাবাদী কর্মীদের জেলে পাঠানো শুরু হয় ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে মদত দেওয়াও দেবার সময় এসেছে, এই দেখিয়ে দেবার দায়িত্ব আবার অর্পিত হল মহাত্মা গান্ধীর উপর। আবার প্রমানিত হল গান্ধীর নেতৃত্বের Af¢lq¡ka¡z

N¡åÑS£ fbj p£¢মত সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রতিটি এলাকার নির্বাচিত অল্পকয়েক জন লোক ব্যক্তিগত ভাবে সত্যাগ্রহ করবে - সত্যাগ্রহীরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রচার চালাবে। বিপিনচন্দ্র মন্তব্য করলেন যে এই সীমিত সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে গান্ধিজী আসন্ন সংগ্রামের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করছিলেন, কংগ্রেস সংগঠনকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করছিলেন এবং সর্বোপরি জনগণকে রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় শিক্ষিত ও সংগঠিত করে তুলেছিলেন।[31]

১৯৪১ এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ একটা বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দিল যা যুদ্ধকে ভারত বর্ষের দোরগোড়ায় নিয়ে আসল। পরিবর্তনের কারণটি হল জাপান জার্মানীর পক্ষে চবিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়ে পার্ল হারবারে মার্কিন নৌবহরের উপর বোমা বর্ষণ করে অতি দ্রুত ফিলিপাইনস ইন্দোচীন ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়া ও ব্রহ্মদেশ দখল করে ভারতবর্ষ আক্রমন করতে উদ্যত হয়। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয়দের সহযোগীতা পাবার জন্য ১৯৪২ এর মার্চে ক্রীপস মিশনকে ভারদে পাঠানো হল। কিন্তু এই মিশন ভারতবাসীকে ডোমিনিয়ন স্টাটাস দেয়ার কথা বলায় এবং যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ভারতীয়দের হাতে কোন রকম ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি না থাকায় ভারতবাসী ক্রিমস মিশন প্রত্যাখান করে।

যুদ্ধের গতি প্রকৃতি ক্রমশই ভারতের পক্ষে বিপদজ্জনক হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় গান্ধিজী মনে করলেন যে ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে চলে গেলেই ভারত জাপানী আক্রমন থেকে রক্ষা পাবে। রি সিদ্ধান্ত ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট গৃহীত হল যাতে বিটিশলে ভারত ছেড়ে চলে যেতে বলা হল এবং এই সময় গান্ধী ঘোষণা লরলেন তাঁর বিখ্যাত সেই মন্ত্র 'করেঙ্গে ইয়ে মরেরে' অর্থৎ হয় আমরা ভারত স্বাধীন করব না হয় চেষ্টা করতে গিয়ে মরব।

৮ই আগস্ট গান্ধিজীর এই ঘোষণার পর ৯ই আগস্ট ভোর বেলা গানছিজী সহ সমস্ত কংগ্রেসী নেতাদের গ্রেপ্তার করা হল। কিন্তু তাতেও আটকানো গেলনা 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। ভারত ছাড় আন্দোলন ছিল একটি স্বতস্ফর্ত গণ আন্দোলন। সমাজের প্রায় সর্বস্তরের মানুষ এতে যোগ দিয়েছিলেন। অহিংস সহিংস উভয় পদ্ধতিতেই এই গণবিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। ১৯৪২ থেকে ৪৪ পর্যন্ত এই আন্দোলন চলেছিল। সরবারের প্রচন্ড দমননীতির পরিপ্রেক্ষিতে এই আন্দোলনের গতিবেগ মন্দীভূত হয়ে আসে।

আগস্ট আন্দোলন সর্বত্র গান্ধী নির্দেশিত অহিংসার পথ অনুসরণ করেনি অনেক স্থানেই আন্দোলন হিংসাত্বক হয়ে উঠেছিল যার জন্য ব্রিটেশ সরকার গান্ধীকেই দায়ী করেএছিলেন। গান্ধী হিংসার জন্য ব্রিটিশ সরকারের সিংহ সদৃশ (Leomine) অত্যাচারী নীতিকেও দায়ী করলেও

বলেছিলেন যে জনগণ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল কিন্তু তিনি এটা চান নি। কিন্তু এটাও ঠিক গান্ধী কিন্তু আন্দোলন স্থগিত করার কথাও বলেন নি।

১৯৪৪ থেকে ৪৭ সালে ছিল ভারতের জাতীয় আন্দোলন ইতিহাসে তথা ভারতের ইতিহাসও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কিত সময় কাল। এই সময় কালের মধ্যে একদিকে যেমন জনগণের স্বাধীনতার ইচ্ছা অদম্য হয়ে উঠেছিল তেমনি অন্য দিকে ব্রিটিশ সরকারও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপে পড়ে বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আপোষ মীমাংসায় আসার চেষ্টা করছিল আবার এই সময়ই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে উপমহাদেশের হাজার হাজার মানুষের প্রাণ গিয়েছিল এই সময় কালের মধ্যে গান্ধিজীর ভূমিকা কি ছিল তা খুবই বিতর্কিত।

১৯৪৫ সালর এপ্রিল মাসে জার্মানীর পতনের পর ভারতের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য ব্রিটিশ সরকার ওয়াভেল পরিকল্পনা পেশ করেন। কিন্তু জিন্ন পাকিস্থান দাবীতে অটল বৈঠক ব্যর্থ হয়।

১৯৪৬ সালের মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা অনুসারে যে সংবিধান সভা ও অন্তবর্তী কালীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাওকংগ্রেস ও লীগের মত পার্থক্যের জন্য ব্যর্থ quz fn¡p¢eL f¢ce¦u¡l মধ্যে দিয়ে পাকিস্তান দাবী পূরণ সম্ভবপর নয় বুঝে জিন্ন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দান যার ফলে সারা দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা - হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে। আজাদ হিন্দ ফৌজের ধৃত সেনাদের লাল কেল্লার বিচার কে উপলক্ষ্য করে সারা দেশে গণ আন্দোলন শুরু হয়। ভারতীয় নৌবাহিনী বিদ্রোহ করে। সব মিলিয়ে এই পরিস্থিতিতে ভারত বিভাগ করে ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান অণীবার্য হয়ে ওঠে যা শেষ পর্যন্ত মাউন্ট ব্যাটেনের পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট কার্যকরী quz

ভারতীয় উপমহাদেশে দুই নতুন রাষ্টের জন্ম হয় ভারত এবং পাকিস্তান। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে গান্ধিজীর মত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এই বিভাগ আটকাতে পারলান না কেন ? সারা জীবন সাম্প্রদায়িক ঐক্যের কথা বিশ্বস করে শেষ পর্যন্ত ধর্মের ভিত্তিতে দেশে ভাগ মেনে নিলেন ? তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে তিনি জিন্নাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে তার সাহসকে বাড়িয়ে নিয়েছেন।[32]বামপন্থীরা অভিযোগ করেছেন যে ১৯৮৬ সালে জনসাধারণের মধ্যে যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ছিল তাকে অবলম্বন করে গান্ধিজী যদি গণ আন্দোলন ডাক দিতেন তবে দেশ বিভাগ এড়ানো যাত।

বস্তুত পক্ষে গান্ধিজী কখনই দেশে ভাগ চান নি। ১৯৪৪ থেকে ৪৭ পর্যন্ত তিনি বহুবার ব্রিটিশ কতৃপক্ষ, কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে ও লীগের সঙ্গে আলোচনার মধ্যে দিয়ে তা আটকাবার চেষ্টা করেছেন। শেষপর্যন্ত পরিস্থিতির চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এক জন সত্যাগ্রহী হিসাবে তিনি আলোচনার মধ্য দিয়ে বিপক্ষের হৃদয় জয় করার চেষ্টা করেছেন। করেছেন। যারা গণ আন্দোলনের কথা বলেছেন তাদের বোঝাউচিত যে সেই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি ছিল তাতে গণ আন্দোলন শুরু করলে তা অবশ্যম্ভাবী ভাবে হিংসাত্বক হয়ে উঠত যা মেনে নেওয়া অহিংসার পূজারীর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। দেশ ভাগের পূর্বে এবং অব্যবহিত পরে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল তা রোধ করার জন্য তিনি যখন

নোয়াখালি থেকে কলকাতা সর্বত্র দাঙ্গা থামাবার চেষ্টায় ছুটে গিয়েছেন ঠিক সেই সময়ে অন্য নেতারা দিল্লীতে বসে ব্রিটিশ কতৃপক্ষের সঙ্গ রাজনৈতিক দরকষাকষি চালাচ্ছিল। যেদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় সেদিন তিনি অনশন করেছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি পাকিস্তানে গিয়ে থাকবার পরিকল্পনা করেছিলেন রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে গঠনমূলক কাজে বেশি করে সময় দিচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি মুসলিমদের বেশি তোষণ করেছেন এই রকম একটি মনোভাব ক্রমশ উগ্রহিন্দুত্ব বাদীদের আচ্ছন্ন করতে থাকে যার পরিণতি হল ১৯৪৮ খৃ ৩০ শে জানুয়ারী দিল্লীর বিড়লা হাউসে প্রার্থনা সভায় নাথুরাম গডসের গুলিতে গান্ধীজীর মৃত্যু, সারা জীবন হিংসার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজেই হিংসার সাতে নিহত হলেন এটাই বোধ হয় তাঁর নিজের এবং ভারতের ইতিহাসের ও অন্যতম ট্রাজেডী।

সূত্র নির্দেশ :-

1z B. R. Nanda - Mahatma Gandhi A Biography.

2z jcm¡ jM¡ ‹ £ - ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম - Ch - N¡å£¢SI f¡l¢ñL LjS£he J p¢œ²ua¡h¡cz

3z jcm¡ jM¡ ‹ £ - তদেবz

4z David Hardiman Gandhi in his own time and ours.

5z B. R. Nanda - Mahatma Gandhi A Biography.

6z jcm¡ jM¡ ‹ £ - ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

7z Judith Brown - Gandhi's Rise to Power -1915-22.

8z Judith Broweh - তদেব

9z S. R. Mehrota - Towards India's Freedom and Partition.

10z Sumit Sarkar - Modern India - 1885 - 1947

11z jqaÈ¡ N¡å£ - ¢q¾c ül¡Sz

12z p¢ja pIL¡l - Bd¢eL i¡la

13z Judith Brown Gandhi's Rise to Power 1915-22

14z Tarachand. History of Freedom Movt. in India - Vol III.

15z Bipan Chandra Modern India

16z Jawaharlal Nehru - An Autobiography

17z মুজফর আহমেদ - কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন নির্বাচিত রচনা সংকলন।

18z M. Gandhi -Young India.

19z p¢ja pIL¡l - Bd¢eL i¡la

20z Subhas Chandra Bose - The India Struggle.

21z অমলেশ ত্রিপাঠী - ü¡d£ea¡ p²গ্রামে জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫-1987z
22z তদেব
23z Sumit Sarkar- The Logic of Gandhian Nationalism.
24z অমলেশ ত্রিপাঠী স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস
25z বিপান চন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচ্ছদ করাচী থেকে ওয়ার্ধা ১৯৩২ থেকে ১৯৩৪
26z ¢hf¡e Q¾c - তদেব
27z ¢hf¡e Q¾c - তদেব
28z p¤ja pIL¡l - Bd¤eL i¡la
29z বিপান চন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম
30z M. Gandhi - Collected Works Vol. 70
31z বিপান চন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচ্ছদ ত্রিপুরী সংকট থেকে ক্রিপস মিশন
32z মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভারত স্বাধীন হল।